International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-V, September 2025, Page No. 10-17
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.05W.125

ধম্মপদের আলোকে বৌদ্ধদর্শনসম্মত পঞ্চশীলের প্রাসঙ্গিকতা

জ্যোতি পান্ডে
ছাত্রী, স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 07.08.2025; Accepted: 20.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper critically examines the continued significance of Pancasila (The Five Precepts) within Buddhist Philosophy, primarily through the lens of the Dhammapada. As a foundational scripture in Buddhism, the Dhammapada holds a canonical status comaparable to the Bhagavad Gita or the Bible in other major religions, representing the direct teachings of the Buddha. The analysis underscores the pivotal role of Sila (moral conduct or ethical purity) as the initial and essential stage of the Eightfold Path (Astangika Marga) towards liberation from suffering. By encompassing right speech, right action, right livelihood, Sila establishes Buddhism as a "Sila-based religion," emphasizing ethical purity as the bedrock of spiritual advancement. The paper meticulously distinguishes between the exoteric (physical and verbal) and esoteric (mental) dimensions of Sila, asserting their intrinsic interconnectedness for achieving comprehensive purity. Furthermore, the paper delineates the historical evaluation of monastic regulations and the specific application of Pancasila for lay adherents. It offers a critical exegesis of each of the five precepts – abstinence from taking life, stealing, sexual misconduct, false speech, and intoxicants – by integrating pertinent verses from the Dhammapada. The study argues that these seemingly prohibitive directives possess profound affirmative implications, fostering virtues such as compassion, veracity, and mental clarity. By drawing parallels to contemporary societal challenges, including violence, corruption, and addiction, the paper elucidates the perennial practical utility of these precepts. Ultimately, the inquiry posits that Sila transcends mere discernment between right and wrong; its ultimate objective is the purification of the mind from defilements like greed, hatred, and delusion, thereby facilitating the attainment of Nirvana.

Keywords: Dhammapada, Buddhist Ethics, Astangika Marga, Sila, Pancasila, Nirvana.

'ধম্মপদ' বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান ধর্মসাহিত্য। ত্রিপিটকের সূত্রপিটকে মোট পাঁচটি অংশের মধ্যে একটি হল খুদ্দক নিকায়। খুদ্দকনিকায়ের পনেরোটি গ্রন্থের মধ্যে ধম্মপদ হল দ্বিতীয় গ্রন্থ। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন, ধম্মপদের উপদেশগুলি তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। হিন্দুদের কাছে যেমন শ্রীমদ্ভগবদগীতা, খ্রীষ্টানদের কাছে যেমন বাইবেল, বৌদ্ধদের কাছেও তেমন 'ধম্মপদ'। ধম্মপদে মোট ছাব্বিশটি অধ্যায়ে ৪২৩টি শ্লোক আছে, তার মধ্যে বিভিন্ন শ্লোকে বৌদ্ধদর্শনসম্মত পঞ্চশীলের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুটিত হয়েছে। এখানে ধম্মপদকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধদর্শনসম্মত পঞ্চশীলের প্রাসঙ্গিকতার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

তথাগত বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের সকল দুঃখের মূল কারণ হল অবিদ্যা অর্থাৎ এই জগৎ এবং জাগতিক বস্তু সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞান। সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে বৌদ্ধ দর্শনে আটটি মার্গ বা পথের কথা বলা হয়েছে, এগুলি হল – সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক

ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি, এই মার্গগুলিকে একত্রে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়। আটটি মার্গকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়, যথা- শীল, সমাধি, এবং প্রজ্ঞা। বৌদ্ধ মতে, এই আটটি মার্গের মধ্যে সম্যক বাক (সম্মাবাচা), সম্যক কর্মান্ত (সম্মাকম্মান্ত) এবং সম্যক আজীব (সম্মাজীব) এই তিনটি মার্গ শীল পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি এই তিনটি সমাধি পর্যায়ের এবং সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।[1] শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা বৌদ্ধ দর্শনে আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তিনটি পর্যায়। এই পঞ্চশীল সমন্বিত অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণের মাধ্যমেই ভবচক্র বা জন্ম-জন্মান্তরের চক্রকে অতিক্রম করে নির্বাণ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। ধম্মপদে 'বুদ্ধবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে- যদি কেউ বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণ নিয়ে (যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙঘঞ্চ সরণং গতো), চারটি আর্যসত্যকে (দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধকারী অষ্টাঙ্গিক মার্গ) সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি পাবেন (সব্বদুক্খা পমুচ্চতি)[2]। এই দুঃখ নিরোধকারী অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে 'শীল' হল চারিত্রিক শুদ্ধতা, 'সমাধি' হল মনঃসংযোগ এবং 'প্রজ্ঞা' হল তত্ত্বজ্ঞান। এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত- এদের কোনটিই একে অপরের ছাড়া ক্রিয়াশীল হতে পারে না। তবে অষ্টাঙ্গিক মার্গের তত্ত্বগুলি ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, বৌদ্ধ নৈতিকতায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে দুঃখ নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভের উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও, শীলের গুরুত্বই সর্বাধিক। এই শীল বা চারিত্রিক শুদ্ধতার দ্বারাই আধ্যাত্মিক অগ্রগতির শুভ সূচনা হওয়ায় বৌদ্ধমতকে 'শীলভিত্তিক ধর্ম' বলেও অভিহিত করা হয়।[3]

বৌদ্ধ দর্শনে 'শীল' শব্দের অর্থ হল সৎ চরিত্র বা সৎ আচরণ। আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে 'শীল' কথাটি সদাচার বা সৎ চরিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাকে নৈতিক চরিত্র বলেও অভিহিত করা হয়। নৈতিক চরিত্র বলতে বোঝায় সেই সব চারিত্রিক অভ্যাস যা নৈতিক নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়।[4] 'শীল' বলতে বোঝায় কর্মে ও বাক্যে নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, শীল বলতে কি তাহলে শুধুই কায়িক এবং বাচিক কর্মেরই সংযম বা পরিশুদ্ধি করা বোঝায়?- না, এই ধারণা যথার্থ নয়, শীল বলতে শুধু বাহ্য আচরণকে (কায়িক এবং বাচিক আচরণকে) বোঝায় না, এর পশ্চাতে রয়েছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য। বৌদ্ধ মতে 'শীল' শব্দের দ্বারা কায়িক-বাচিক কর্মের পরিশুদ্ধি বোঝালেও চেতনা এর অন্তর্ভুক্ত। কায়িক ও বাচিক যেকোন কর্মের পেছনেই রয়েছে চেতনা। চেতনা ছাড়া কর্ম সম্পাদন হতে পারে না। বুদ্ধ বলেছেন- 'চেতনা হং ভিকখবে কম্মং বদামি, চেতয়িত্বা কম্মং করোতি হীনং বা পনীতং বা' অর্থাৎ, হে ভিক্ষুগণ আমি চেতনাকেই কর্ম বলি, চিন্তা করেই ব্যক্তি ভালো-মন্দ কর্ম সম্পাদন করে।[5] ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, আমাদের চৈতন্য প্রবাহ লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছন্ন এবং এই রিপুগুলিই আমাদের অধিকাংশ চিন্তা, অভ্যাস, ক্রিয়াকলাপের উৎস। এই জন্য কায়-বাক্যে পরিশুদ্ধির সাথে সাথে চিত্তের পরিশুদ্ধিও প্রয়োজন। সুতরাং এখানে শীলের দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়- একটি হল বাহ্যিক দিক, যা বাহ্য ক্রিয়াকলাপের (কায়িক-বাচিক) পরিশুদ্ধি এবং অপরটি হল আভ্যন্তরিক দিক, যা মানসিক ক্রিয়াকলাপের পরিশুদ্ধি। যেহেতু বাহ্য ও আন্তর জগত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তাই একটিকে অপরটির শুদ্ধিকরণের উপায় হিসাবে অবলম্বন করা যেতে পারে। এই দুটি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারা একই সমগ্রের দুটি দিক মাত্র। অশুদ্ধ চিত্তের প্রভাব যেমন আমাদের বাহ্যিক কর্মে প্রকাশ পায়, তেমনি বিশেষ কিছু বাহ্যিক কর্মে বারংবার বিরত থেকে চিত্তের মূল প্রবণতার পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। যেমন- ঘৃণা, লোভ ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ নানা প্রকার হিংসাত্মক কর্মে (যেমন- হত্যা করা, চুরি করা ইত্যাদি) লিপ্ত হয়। আবার অপরদিকে এই প্রকার হিংসাত্মক কর্ম থেকে বারংবার বিরত থাকার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির চিত্তের লোভ, দ্বেষাদি রিপুগুলি দমন করে দয়া, সততা, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি গুনগুলি বিকশিত করা সম্ভব। ধম্মপদে 'ভিকখুবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'কায়েন সংবরো সাধু,

---

[1] স্বামী বিদ্যারণ্য, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

[2] শ্রী চারুচন্দ্র বসু, ধম্মপদ, 'বুদ্ধবগ্গো' শ্লোক ১২-১৪, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০।

[3] অমিতা চ্যাটার্জী সম্পাদিকা, ভারতীয় ধর্মনীতি, পৃষ্ঠা ২৬২।

[4] তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৫।

[5] ড. সুকোমল চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, পৃষ্ঠা- ৫৪-৫৫।

সাধু বাচায় সংবরো, মনসা সংবরো সাধু সাধু সব্বত্থ সংবরো, সব্বত্থ সংবুতো ভিক্ষু সব্বদুক্খা পমুচ্চতি'[6] অর্থাৎ কায় (দেহ) সংযম মঙ্গলকর, বাক্য সংযম মঙ্গলকর, চিত্ত (মন) সংযম মঙ্গলকর, সর্বপ্রকার সংযম মঙ্গলকর, যিনি সর্বপ্রকার বিষয়ে সংযমী হতে পারেন তিনি সর্বপ্রকার ক্লেশ (দুঃখ) থেকে মুক্ত হন। সুতরাং শীল হল কায়-মন-বাক্যে সর্বপ্রকার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে সৎ চরিত্র গঠন, যার দ্বারা সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।

সাধারণ গৃহস্থ মানুষ এবং শ্রমণদের শান্তিপূর্ণ নৈতিক জীবনযাপনের জন্য গৌতম বুদ্ধ প্রতিদিন বেশ কিছু শীল পালন করার উপদেশ দিয়েছেন। বিনয়পিটকে বহু সংখ্যক শীলের কথা উল্লেখ থাকলেও শ্রমণ বা সন্ন্যাসীদের জন্য যে সকল শীল পালনের উপদেশ রয়েছে, তা গৃহস্থ বা সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে আবশ্যক নয়। বুদ্ধদেব গৃহীদের জন্য (অর্থাৎ যারা গৃহে থেকে সংসারধর্ম পালন করেন) পঞ্চশীল এবং বিশেষ কিছু তিথিতে অষ্টশীল পালনের বিধান দিয়েছেন। আর যারা ভিক্ষু বা শ্রমণ, তাদের জন্য দশশীল থেকে শুরু করে ২২৭ টি শীলের বিধান দিয়েছেন।[7] যখন বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠা হয় তখন মাত্র দশশীলেরই বিধান ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে যখন সংঘ আয়তনে বড়ো হতে থাকে, ততই দিন দিন নানাবিধ ঘটনা ঘটতে থাকে। বিশেষতঃ ভিক্ষুনী সংঘ প্রতিষ্ঠা, জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং চতুর্প্রত্যয় (আহার, বস্ত্র বা চীবর, বাসস্থান ও ভৈষজ্য) দাতাদের কাছ থেকে দানস্বরূপ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করার পর থেকে শ্রামণদের মধ্যে এগুলিকে ঘিরে নানা প্রকার অপব্যবহার দেখা দিতে থাকে, এবং এক একটি ঘটনা ঘটতে থাকে। ভিক্ষুরা বুদ্ধের নিকট এই সব ঘটনা উপস্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই ঘটনাগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ঘটনাটি সত্যিই অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ, জন সমাজে নিন্দনীয়। তখন তিনি এরূপ আচরণে তীব্র ভৎসনা জানিয়ে বিধান দেন যে, যেসকল ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী এইরূপ আচরণ করবেন তার এই দোষ বা পাপ হবে (যেমন- দুক্কট, পাচিত্তিয়), এবং এই দোষ থেকে মুক্তি পেতে তাকে এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাজেই বলা যায়, এই শীলগুলি বা নীতিগুলি তথাগত বুদ্ধ একদিনে প্রদান করেননি। দিন দিন ঘটনা ঘটতে থাকলে শীলের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে ২২৭ টি সংখ্যায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ ভিক্ষু ভিক্ষুনী কোন অপকর্ম করলে তা এই ২২৭ টি শীলের দ্বারা বিবেচিত হবে। বিনয়পিটকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষু ভিক্ষুনীদের দৈনন্দিন কর্মের (যেমন- ভোজন গ্রহণ, স্নান করা, বস্ত্র বা চীবর পরিধান ইত্যাদি) সাথেই শীল বা বিনয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সেসময় এই শীলগুলি সংঘের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য বিহিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বর্তমান সময়েও এর প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্ট রয়েছে।

বৌদ্ধ দর্শনে 'পঞ্চশীল', 'অষ্টশীল' এবং 'দশশীল' পালনের কথা বলা হয়েছে। এই শীলগুলি হল-

১) প্রাণাতিপাত বিরতি, অর্থাৎ প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা।
২) অদত্তাদান বিরতি, অর্থাৎ অপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৩) অব্রহ্মচর্য বিরতি, অর্থাৎ কামসমূহ থেকে বিরত থাকা।
৪) মৃষাবাদ বিরতি, অর্থাৎ মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকা।
৫) সুরামৈরেয় মাদকার্থ বিরতি, অর্থাৎ মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৬) বিকালভোজন বিরতি, অর্থাৎ অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।
৭) নৃত্যগীতবাদিত্র বিরতি, অর্থাৎ নাচ, গান, বাদ্য বিলাসিতা থেকে বিরত থাকা।
৮) মাল্য-গন্ধ বিলেপন বিরতি, অর্থাৎ অঙ্গরাগ, স্বর্ণালঙ্কারসজ্জা ইত্যাদি থেকে বিরত।
৯) উচ্চাসনশয়ন বিরতি, অর্থাৎ আরামপ্রদ শয্যায় শয়ন করা থেকে বিরত থাকা।
১০) জাতরূপরজত পরিগ্রহ বিরতি, অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ, মুক্তো ইত্যাদি থেকে বিরত।[8]

এই দশটি শীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি শীল সাংসারিক ব্যক্তিদের জন্য অবশ্য পালনীয় শীল, এদের একত্রে 'পঞ্চশীল' বা 'পঞ্চশিক্ষাপদ' বলে। গৃহস্থদের ক্ষেত্রে এগুলি অবশ্য পালনীয় বলে এগুলিকে 'গৃহস্থশীল'ও বলা হয়।[9] আর প্রথম

---

[6] ভিক্ষু শীলভদ্র, ধম্মপদ, ভিকখুবগ্গো, শ্লোক ২, পৃষ্ঠা- ৮৮।
[7] ভিক্ষু শীলভদ্র, ধম্মপদ, পৃষ্ঠা- ৫৪।
[8] পবিত্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), বিনয়পিটক, মহাবর্গ, পৃষ্ঠা- ৭৮৪।
[9] দীক্ষিত গুপ্ত, নীতিশাস্ত্র, পৃষ্ঠা- ৫২।

আটটি শীল অর্থাৎ 'অষ্টশীল' বিশেষ দিনগুলিতে, যেমন- পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথির মতো বিশেষ বিশেষ তিথিতে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রমণ বা নবীন সন্ন্যাসীদের জন্য উপরিক্ত 'দশশীল' পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীল পালনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, আত্ম-সচেতনতার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। শীলের সহায়তায় চিত্ত পবিত্র ও প্রশান্ত হয়, জাগতিক বস্তুর প্রতি ধীরে ধীরে অনাসক্তি জাগ্রত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করার প্রবৃত্তি জাগে।

উপরিক্ত বাক্যগুলির দ্বারা মনে হতে পারে, 'শীল' বলতে কি কেবল নঞর্থক বাক্যকেই বোঝায়? এখানে বলা বাহুল্য, এই দশশীলগুলি এবং বিশেষতঃ পঞ্চশীল আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক বলে মনে হলেও আসলে এই শীলগুলির ইতিবাচক দিকও বর্তমান। বৌদ্ধদর্শনে শীলের মাধ্যমে কি কি করণীয় নয় সেকথা যেমন বলা হয়েছে, ঠিক তেমনি কি কি আমাদের করণীয় কর্তব্য সেকথাও বলা হয়েছে। এই দিক থেকে 'শীল'-এর দুটি দিক পরিস্ফুটিত হয়, একটি দিক হল 'বারিত্রশীল' এবং অপরটি হল 'চারিত্র্যশীল'। বুদ্ধদেব আমাদের যেসমস্ত কর্ম করতে নিষেধ করেছেন সেগুলিকে বলা হয় 'বারিত্রশীল', আর যে সমস্ত কর্ম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে 'চারিত্র্যশীল' বলা হয়।[10] প্রাণাতিপাত-বিরতি, মৃষবাদ-বিরতি ইত্যাদি বাক্যের নেতিবাচক দিক থেকে যেমন বলা হয়েছে 'প্রাণী হত্যা করবে না', 'মিথ্যা কথা বলবে না', তেমনি এই বাক্যগুলির সদর্থক বা ইতিবাচক দিক হল- প্রত্যেক জীবের প্রতি প্রেম, সদাচার পালন করবে, সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন মনোভাব পোষণ করবে, সকলের মঙ্গল কামনা করবে, সর্বদা সত্য কথা বলবে, সত্যের পথে চলবে ইত্যাদি।

ধম্মপদের ভিত্তিতে বৌদ্ধসম্মত 'পঞ্চশীল'গুলি প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল-

১) <u>প্রাণাতিপাত-বিরতি (পানং ন হানে)-</u> বৌদ্ধদর্শনে প্রাণাতিপাত-বিরতি বলতে বোঝায় সর্ব প্রকার প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা। 'প্রাণী' বলতে এখানে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সর্বপ্রকার সজীব প্রাণীকেই বোঝানো হয়েছে। এই পৃথিবীতে সকলেই বাঁচতে চাই, সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ধম্মপদে 'দণ্ডবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্ববে ভায়ন্তি মচ্চুনো, অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে'[11] অর্থাৎ সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে, অতএব নিজেকে প্রভু মনে করে অন্যকে দণ্ড দেওয়ার পূর্বে চিন্তা করা উচিত যে ঐ স্থানে যদি আমাকে দণ্ড দেওয়া হত, তাহলে আমার কেমন লাগত? সেরকম অন্য প্রাণীদেরও মনে হয়, তাই কাউকে আঘাত বা হত্যা করা উচিত নয়। নিজের জীবন সকলের কাছেই প্রিয় (সব্বেসং জীবিতং পিয়ং)[12], কাজেই কাউকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কেবল নৈতিকভাবে অন্যায়ই নয়, চরম পাপও বটে। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকেই নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, বিশেষতঃ শক্তিপূজায় 'বলিদান' একটি অত্যন্ত আবশ্যিক উপাচার রূপে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। 'কালিকা পুরাণ'-এ বলি প্রকরণ অধ্যায়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আরাধ্য দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য পশু বলিদান, এমনকি নর বলিদান সম্পর্কেও বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে।[13] বর্তমান যুগেও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলিপ্রথার এখনও প্রচলন রয়েছে। আমরা পুণ্য অর্জনের জন্য নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেভাবে নিরীহ প্রাণীদের বলি দিই, সত্যিই কি তাতে আমাদের পুণ্যার্জন হয়? সত্যিই কি কারোর জীবন কেড়ে নিজে সুখী হওয়া যায়? বৌদ্ধ দর্শন ঠিক এর বিপরীত মতামত প্রচার করে, এখানে বলা হয় প্রাণী হত্যা একটি হিংসাত্মক কর্ম, আর হিংসা সর্বদা হিংসারই জন্ম দেয়, তা কখনই মানুষকে মোক্ষাভিমুখী করতে পারে না। ধম্মপদে বলা হয়েছে, 'সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি, অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং'[14] অর্থাৎ যে নিজের সুখের জন্য অন্যকে দণ্ড দিয়ে হিংসাত্মক কর্ম করে, সে পরলোকে গিয়েও কোন প্রকার সুখ পায় না। নিজের নিজের কর্মের ফল সকলকেই ভোগ করতে হয়। যতক্ষণ না ব্যক্তির পাপ কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয়, ততক্ষণ সেই ব্যক্তি তার কৃত কর্মকে সুখদায়ক বলে মনে করে। পাপ কর্ম যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার ফল একদিন না একদিন ঠিক ভোগ

[10] চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, পৃষ্ঠা- ৫৫।

[11] বসু, ধম্মপদ, 'দণ্ডবগ্গো' শ্লোক ১, পৃষ্ঠা- ৮৩।

[12] তদেব, 'দণ্ডবগ্গো' শ্লোক ২, পৃষ্ঠা- ৮৩।

[13] শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিকা পুরাণ (প্রথম খণ্ড), বলি প্রকরণ, পৃষ্ঠা- ৫৫০।

[14] বসু, ধম্মপদ, 'দণ্ডবগ্গো' শ্লোক ৩, পৃষ্ঠা- ৮৪।

করতেই হয়। যদি কোন ব্যক্তি অযথা ইচ্ছাকৃতভাবে একটি পিপীলিকাকে হত্যা করে ভাবে যে, এই ক্ষুদ্র পাপে আমার কিছু হবে না, তাহলে বলা যায়, তার এরূপ ভাবনা ভ্রান্ত। ধম্মপদে 'পাপবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপকর্মকেও অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ মনে রাখা উচিত বিন্দু বিন্দু জলকণা দিয়েই কুম্ভ বা কলস পূর্ণ হয় (উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি)[15]। ঠিক সেরকম মূর্খ ব্যক্তি তার অপকর্মের দ্বারা অল্প অল্প করে পাপ চয়ন করলেও, অবশেষে দেখা যায় তার পাপের কলস পূর্ণ হয়ে গেছে। একজন ভিক্ষুর যেমন অহিংসক হওয়া কর্তব্য তেমনি একজন গৃহস্থেরও অহিংসক হওয়া অবশ্যিক কর্তব্য। বৌদ্ধ দর্শনে 'হিংসা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন প্রাণীকে কেবলমাত্র শারীরিকভাবে হত্যা করাই হিংসা নয়, বরং কোন প্রাণীর প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব বা অমঙ্গল চিন্তা করাও হিংসা রূপে গণ্য হয়। সেজন্য বৌদ্ধ মতে বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে কায়-মন-বাক্যে অহিংসক হওয়া প্রয়োজন।

২) <u>অদত্তাদান-বিরতি (ন চাদিন্নমাদিয়ে)-</u> অদত্তা দানের অর্থ হল, যে দ্রব্য দান করা হয়নি, এমন দ্রব্য গ্রহণ করা বা চুরি করা থেকে বিরত থাকা। মানুষের চাহিদার কোন অন্ত নেই, একটি বিষয় পাওয়া হলে আবার তার কামনা অন্য বিষয় পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। মানুষের বিষয় বাসনা কখনো মেটে না, অপূরণ আশা থাকতে থাকতে অবশেষে মৃত্যুর সময় এসে পড়ে। অতিরিক্ত সম্পত্তি ভোগের লালসায় মানুষ পরিবেশের ক্ষতি করতে, এমনকি অপর মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না। বৌদ্ধ দর্শন বাস্তববিমুখ নয়, বাস্তবে জীবনযাপন করার জন্য অবশ্যই ইহজাগতিক বিষয় বস্তুর প্রয়োজন হয়। এজন্য ধম্মপদে বলা হয়েছে, 'যথাপি ভমরো পুপ্ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠয়ং, পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনি চরে'[16] অর্থাৎ ভ্রমর যখন ফুলের মধু আহরণ করে তখন সে ফুলের বর্ণ গন্ধের কোন ক্ষতি করে না, ঠিক সেরকম ভিক্ষু বা শ্রমণ গ্রামে বিচরণ করে কারোর কোন ক্ষতি না করে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। আমাদের জীবনযাপনের ভঙ্গিমাটাও ঠিক এরকমই হওয়া উচিত। একজন ভিক্ষু বা গৃহীর সুষ্ঠ জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, এই জগত থেকে কারোর কোন ক্ষতি না করে ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। অপরের অদেয় বস্তু গ্রহণ করা বা অপরের বস্তু না বলে গ্রহণ করাকে চৌর্যবৃত্তি (চুরি) রূপেই অভিহিত করা হয়, যা অবশ্যই নিন্দণীয় বা পাপকর্ম। কেবলমাত্র না বলে অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করাই চৌর্যবৃত্তি নয়, অপরকে প্রতারণা করে বা ঠকিয়ে তার সম্পদের অধিকারী হওয়াও চৌর্যবৃত্তির সমতুল্য। বর্তমান সমাজে জুয়া বা gambling এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে লোভ, অপ্রীতি, ঘৃণা, প্রতারণা, বর্বরতা, মিথ্যাচার, কঠোর ভাষণ দেখা দেয়।[17] জুয়া জাতীয় আসক্তিমূলক কর্ম মানুষের বিপত্তি বাড়ায়, এর দ্বারা বিজয়ী ব্যক্তি নিজের শত্রু বাড়ায়, হেরে যাওয়া ব্যক্তি নিজের ক্ষতির জন্য বিলাপ করে, নিজ সম্পদ নষ্ট করে, অন্যদের ঘৃণার পাত্র হয়। এর প্রতি আসক্ত হয়ে মানুষ ধীরে ধীরে সর্বহারা হয়ে পড়ে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মহাভারতের পাশাখেলা। ধম্মপদে 'সুখবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো, উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং'[18] অর্থাৎ যিনি বিজয় হন তিনি বিজয়ের অহংকার করেন, যিনি পরাজয় হন তিনি দুঃখ করেন, কিন্তু যিনি এই দুয়ের মাঝে থাকেন তিনিই সুখে থাকেন। বৌদ্ধধর্মে চুরির দুটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হল অন্য ব্যক্তির সম্মতি না নিয়ে তার সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া। আর পরোক্ষ পদ্ধতি হল ছল বা প্রতারণা করে অন্যের সম্পত্তি নিজের করে নেওয়া। মানুষ তার আসক্তির নিবৃত্তির জন্য এরূপ আচরণ বা কুকর্ম করে থাকে। 'মলবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'নত্থি রাগসমো অগ্গি নত্থি দোসসমো গহো, নত্থি মোহসমং জলং নত্থি তণ্হাসমা নদী'[19] অর্থাৎ আসক্তির মতো অগ্নি নেই, বিদ্বেষের মতো গ্রাসকারী নেই, মোহের মতো জাল (বন্ধন) নেই, আর তৃষ্ণার সমান নদী নেই। মানুষের আসক্তির জ্বালা এতই তীব্র যে, সেটা আসক্তিকারী ব্যক্তিকে যেমন দগ্ধ করে, তেমনি তার সাথে অন্যান্য ব্যক্তির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের বিদ্বেষকে কুমীরের (কুম্ভীরাদি)

---

[15] তদেব, 'পাপবগ্গো' শ্লোক ৫-৬, পৃষ্ঠা- ৭৬-৭৭।

[16] শীলভদ্র, ধম্মপদ, 'পুপ্ফবগ্গো' শ্লোক ৬, পৃষ্ঠা- ১৪।

[17] Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics, page- 70.

[18] বসু, ধম্মপদ, 'মলবগ্গো' শ্লোক ১৭, পৃষ্ঠা- ১৫৫।

[19] তদেব, 'পুপ্ফবগ্গো' শ্লোক ১১, পৃষ্ঠা- ৩৩-৩৪।

মতো হিংস্রজন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কবলে পড়া শিকারকে কুমীর যেমন জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, সেইরূপ বিদ্বেষও মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। জালের মধ্যে মাছ যেভাবে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করে, মানুষও সেই রকম মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় দুঃখভোগ করে। তৃষ্ণাকে নদী সাথে তুলনা করা হয়েছে, নদী যেমন বয়ে চলে, মানুষের তৃষ্ণাও তেমন অন্তহীনভাবে বয়ে চলে। কাজেই কায়-মন-বাক্যে শীল পালনের দ্বারা সর্বপ্রথম তৃষ্ণার গতিকে সংযম করা প্রয়োজন, তৃষ্ণা সংযম হলে মানুষের বিষয়ের প্রতি আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহের বেড়াজালও ভঙ্গ হয়।

৩) <u>অব্রহ্মচর্য-বিরতি (ব্রহ্মচারিয়ঞ্চ মঙ্গলমুত্তম)-</u> 'কাম' মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং চতুর্বিদ পুরুষার্থের অন্তর্গত। কিন্তু মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে সহজাত কাম যখন অবৈধ কামাচারে পরিণত হয়, তখন তা মানুষকে বিপথে চালিত করে। বৌদ্ধ মতে, অবৈধ কামনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকাই হল অব্রহ্মচর্য-বিরতি। কামকে হতে হবে সংযত, পরস্ত্রীকে মাতৃসম, ভগ্নীসম এবং কন্যাসম মনে করে তার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ প্রদর্শন করতে হবে। একজন গৃহস্থ ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, অবৈধ কামাচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না। ধম্মপদে বলা হয়েছে, মল্লিকা বা অন্য কোন সুগন্ধি ফুলেও গন্ধ বায়ুর সাথে একই দিকে প্রবাহিত হয়, কিন্তু বায়ুর বিপরীতে প্রবাহিত হতে পারে না। কিন্তু একজন সৎ চরিত্রবান ব্যক্তির যশঃ-সৌরভ সকল দিকেই প্রবাহিত হয় (সব্বা দিসা সপ্পু রিসো পবাতি)[20]। সৎ চরিত্র ব্যক্তির সৌরভকে চন্দন, চামেলির সুগন্ধও অতিক্রম করতে পারে না, চরিত্রবানের চারিত্রিক সুগন্ধ দেবলোকেও প্রবাহিত হয়। অবৈধ কামাচার নৈতিক দিক থেকেও অন্যায়, কারণ অনৈতিক কামাচার কেবল ব্যক্তির চরিত্রকেই কলঙ্কিত করে না, বরং সমগ্র সমাজেই তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধম্মপদে 'অরহন্তবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'গামে বা যদি বা'রঞ্ঞে নিম্নে বা যদি বা থলে, যত্থাররন্তো বিহরন্তি তং ভূমিং রামণেয্যকং'[21] অর্থাৎ গ্রামে, অরণ্যে, নিম্ন বা উন্নত দেশে, ভিক্ষু অর্থাৎ সৎ চরিত্রের ব্যক্তি যেখানেই থাকেন, সেই ভূমি (স্থান) সুন্দর বা রমণীয় করে রাখেন। তাই বলা যায়, মানুষের সৎ চরিত্রই পারে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে। এই উপদেশ অনুসরণ করলে বর্তমান সমাজে প্রায়শ্চয়ই ধর্ষণের মতো অনৈতিক ঘটনা থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া সম্ভব। এছাড়া বর্তমানে যৌন অসদাচরণের কারণে HIV সংক্রমণের মতো ঘটনাও হ্রাস করা সম্ভব হবে।

৪) <u>মৃষাবাদ-বিরতি (মুসা ন ভাসে)-</u> মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা হল মৃষাবাদ বিরতি। ভিক্ষু এবং গৃহস্থ ব্যক্তি উভয়ই মিথ্যা বাক্য বলবে না, কাউকে মিথ্যা বাক্য বলতে প্রবৃত্ত করবে না, কেউ মিথ্যা বললে তাকে অনুমোদন করবে না- এরূপ সর্বপ্রকার মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। ধম্মপদে 'নিরয়গামী' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কৃত কর্মকে অস্বীকার করেন অর্থাৎ যদি বলেন 'আমি এটা করিনি' তাহলে সে পাপের ভাগী হয়ে নরকে গমন করবেন (যো বাপি কত্বা 'ন করোমী'তি চাহ)[22]। বৌদ্ধ দর্শনে কেবলমাত্র কৃত কর্মের অস্বীকার করাই মৃষাবাদ নয়, পিশুনবাক্য (হিংসা পরায়ণ বাক্য), পরুষ বাক্য (নিষ্ঠুর বা কর্কশ বাক্য), সংপ্রলাপ বাক্য (অহেতুক বা নিরর্থক বাক্য)- এগুলিও মৃষাবাদ বা মিথ্যাবাক্যের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র কায়িক কর্মই হিংসাত্মক হয় না, বাক্য ব্যবহারের দ্বারাও হিংসা প্রদর্শিত হয়। শারীরিক ভাবে কাউকে হত্যা করা যেমন পাপ, তেমনি কাউকে 'হত্যা করব'- এরূপ বাক্য প্রয়োগ করাও অন্যায়। কারোর প্রতি নিষ্ঠুর বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। ধম্মপদে বলা হয়েছে, 'মা বোচ ফরুসং কঞ্চি, বুত্তা পটিবদেয্যু তং, দুক্খা হি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়্যু তং'[23] অর্থাৎ কাউকে কর্কশ বাক্য বলো না, যাকে কর্কশ বাক্য বলবে, সে তোমায় পুনরায় কর্কশ বাক্য বলবে, ক্রোধপূর্ণ প্রতুত্তর বাক্য দুঃখদায়ক। সুন্দর ভাষণের দ্বারা যে কর্ম সম্পাদন হয় কর্কশ বাক্যের দ্বারা তা কখনই হয় না, মিষ্টভাষী সর্বদাই সকলের কাছে প্রিয় হয়। আবার কিছু ব্যক্তি অযথা বহু বাক্য প্রয়োগ করেন, নিজের পাণ্ডিত্য বোঝাতে গিয়ে যেখানে যা বলা নিরর্থক, তাই বলেন। ধম্মপদে 'ধম্মট্ঠবগগো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু

---

[20] শীলভদ্র, ধম্মপদ, 'অরহন্তবগ্গো' শ্লোক ৯, পৃষ্ঠা- ২৬।

[21] বসু, ধম্মপদ, 'নিরয়বগ্গো' শ্লোক ১, পৃষ্ঠা- ১৮৭।

[22] তদেব, 'দণ্ডবগ্গো' শ্লোক ৫, পৃষ্ঠা- ৮৫।

[23] রামপ্রাসাদ সেন, ধম্মপদ, 'ধম্মট্ঠবগ্গো' শ্লোক ৩-৪, পৃষ্ঠা- ৮৮।

ভাসতি, খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো তই পবুচ্চতি'[24] অর্থাৎ বহু বাক্য ব্যবহার করলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না, বরং স্বল্প বাক্যের দ্বারা যিনি শান্ত, মঙ্গলকারী, দ্বেষহীন, নির্ভীকতার পরিচয় দেন তাকেই পণ্ডিত বলা হয়। বর্তমান সময়েও আমরা দেখি, বিভিন্ন জায়গায় আড়ম্বর করে প্রবচনের ব্যবস্থা করা হয়, এবং বহু সংখ্যক মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়ে প্রবচন শুনতে যান। কিন্তু তাতে কি মানুষের আচরণের সত্যিই কোন পরিবর্তন হয়? ধম্মপদের 'সহসসবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'সহস্সমপি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা, একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি'[25] অর্থাৎ সহস্রসংখ্যক নিরর্থশব্দসমন্বিত বাক্য থেকে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রেয়ঃ, কারণ তা শুনলে লোকে শান্ত হয়, লোকের মঙ্গল হয়। মৃষাবাদ-বিরতির দ্বারা আবার পরনিন্দা-চর্চা থেকেও বিরত থাকার কথা বলা হয়। আমরা নিজেরা যদি কোনো দোষ করি, তাহলে সেই দোষ আমরা মেনে নিতে পারি না, কিন্তু অন্যের সামান্য ভুলও আমাদের ঠিক চোখে পড়ে। পরের দোষ খুঁজে, তাকে নিয়ে নিন্দাচর্চা করি। অন্যের খুঁত খুঁজে বের করে, তাকে উপদেশ দেওয়া খুব সহজ কাজ। কিন্তু নিজের দোষ দেখে, নিজেকে সংযত করা বা নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন কাজ। সেজন্য অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে সেই উপদেশ পালন করা জরুরি, আগে নিজেকে সংযত করতে পারলে তবেই অন্যকেও সংযত করা যায়। 'অত্তবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'অত্তানং চে তথা কয়িরা যথঞ্ঞমনুসাসতি, সুদন্তো বত দমেথ অত্তাহি কির দুদ্দমো'[26] অর্থাৎ 'অন্যকে যা দিচ্ছ শিক্ষা, নিজেকে আগে সেইমত শিক্ষিত কর, আত্মদমন-বড় সে কঠিন ব্রত'। এই পৃথিবীতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেউ নেই, যিনি নিন্দা করছে, তাকে নিয়েও আবার অন্যরা নিন্দা করছে। এই নিন্দার চর্চা বহু পুরাতন, যিনি স্বল্পভাষী তাকে নিয়েও লোকে নিন্দা করে, যিনি বহুভাষী তাকেও নিন্দা করে আর যিনি মিতভাষী তাকেও লোকে নিন্দা করে। কাজেই কে কি বলল, প্রশংসা করল না নিন্দা করল, তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, এতে নিজেরই মানসিক শান্তিতে, কর্মে বিঘ্ন ঘটে। সেজন্য 'পণ্ডিতবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা'[27] অর্থাৎ পর্বতকে যেমন প্রচন্ড হাওয়া বা ভীষণ ঝড় বিচলিত করতে (কাঁপাতে) পারে না, তেমনি অপরের নিন্দা ও প্রশংসা পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিচলিত করতে পারে না।

৫) <u>সুরামৈরেয় মাদকার্থ-বিরতি (ন চ মজ্জপোসিয়া)-</u> এই উপদেশের দ্বারা বৌদ্ধ দর্শনে সুরা, মদ জাতীয় মাদক দ্রব্য থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সমাজে বহু মানুষ আছে যারা প্রায়শ্চই মাদক দ্রব্যে নিমজ্জিত থাকে, যার ফলে তাদের নানা পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়। মাদক দ্রব্য সেবন করলে ব্যক্তির চিত্ত নিম্নগামী হয়, যা তাকে পতনের দিকে চালিত করে। যে দ্রব্য সেবন আমাদের অস্বাভাবিক করে তোলে, শারীরিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে থাকে না, মানসিক চাঞ্চল্যতা বৃদ্ধি করে, ঠিক-ভুলের বিচার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে- এরূপ দ্রব্য কখনই গ্রহণ করা উচিত। মাদক দ্রব্য মানুষের সৎ কর্মের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষের মধ্যে থাকা মহৎ গুণাবলী হ্রাস পায়[28]। ধম্মপদে 'লোক বগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে, ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ'[29] অর্থাৎ অসৎ কর্ম ত্যাগ করে সৎ কর্ম পালন করা উচিত, তাহলে সেই ধর্মচারী ব্যক্তি ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকেই সুখে থাকেন। মাদক দ্রব্য কেবল ব্যক্তিকে নয়, তার সাথে সমগ্র সমাজকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শীল পালনের লক্ষ্য কি কেবল আমাদের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত কর্মের মধ্যে পার্থক্য করা? এখানে বলা যেতে পারে, শীল বা নীতি পালনের লক্ষ্য নিছক ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করা নয়, এর লক্ষ্য আরো গভীরে। বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন সমগ্র মানব সমাজ দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। মানুষ তৃষ্ণার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। মানুষের মনে বাসা বেঁধে

[24] বসু, ধম্মপদ, 'সহস্সবগ্গো' শ্লোক ১, পৃষ্ঠা- ৬৫।
[25] শীলভদ্র, ধম্মপদ, 'অত্তবগ্গো' শ্লোক ৩, পৃষ্ঠা- ৪১।
[26] শীলভদ্র, ধম্মপদ, 'পণ্ডিতবগ্গো', শ্লোক ৬, পৃষ্ঠা- ২১।
[27] সেন, ধম্মপদ, 'লোকবগ্গো' শ্লোক ৩, পৃষ্ঠা- ৬০।
[28] Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics, page- 77.
[29] শীলভদ্র, ধম্মপদ, 'লোকবগ্গো' শ্লোক ৩, পৃষ্ঠা- ৪৩।

থাকা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য- এই ষড়রিপুই মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের মূলে রয়েছে। যার কারণে জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমাদের ভ্রান্ত ধারণা গড়ে ওঠে, এবং এর পরিণামে আসে দুঃখ। এই দুঃখের অবসান ঘটাতে হলে চিত্তকে কামনা-বাসনা, মুক্ত এবং সৎ চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন। সেজন্যই বুদ্ধদেব শীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। বুদ্ধদেব মৈত্রী, করুণাভাবকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং এর পথ হল শীল। শীলের দ্বারাই কায়-মন-বাক্য কলুষমুক্ত হয়, ফলে ব্যক্তি তার সৎ চরিত্র গঠন করতে পারে এবং ধীরে ধীরে সমাধি ও প্রজ্ঞার দিকে অগ্রসর হয়ে নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করতে পারে।

বৌদ্ধ দর্শন পাঠ করলে দেখা যায়, তথাগত বুদ্ধের কাছে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক সমস্যা, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সমস্যারই প্রাধান্য ছিল। এই সমস্যা থেকে কীভাবে নিবৃত্তি পাওয়া যেতে পারে তিনি সেদিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করার জন্য কঠিন কঠিন তত্ত্বের আলোচনা, যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করা নিষ্প্রয়োজন। ধম্মপদের 'দণ্ডবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, উলঙ্গ থেকে, মাথায় জটা রেখে, অনশন করে, সারা শরীরে ছাই-ভস্ম মেখে, ভূমিতে শয়ন- এই সকল কিছুই তৃষ্ণাধীন মানুষকে শুদ্ধি দান করতে পারে না (ন নগ্গচরিয়া ন জটা ন পঙ্কা নানাসকা থণ্ডিলসায়িকা বা)[30]। কাজেই বলা যায়, কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করে, তত্ত্বের আলোচনা করে, বিপুল অর্থ ব্যয় করে যজ্ঞ করলেই মানব জীবনের মূল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে অর্থাৎ নির্বাণ স্তরে পৌঁছাতে গেলে চারিত্রিক শুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। 'অত্তবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, মানুষ নিজেই নিজের আশ্রয় (অত্তা হি অত্তনো নাথো)[31], অন্য কেউ তার আশ্রয় নয়, তাই নিজেই নিজেকে মঙ্গল কর্মে লিপ্ত করতে হবে। শীল অনুসরণের দ্বারা সাধারণ মানুষ তাদের জীবনকে শুদ্ধ ও পরিশীলিত করতে পারে। ব্যক্তি চরিত্র পরিশুদ্ধ হলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলাও বজায় থাকে। এই জন্য 'ব্রাহ্মণবগ্গো' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং, সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং'[32] অর্থাৎ কায়-মন-বাক্ এই তিনভাবে যিনি সংযত, দুষ্কৃতিহীন এবং সুকর্মে রত, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ রূপে পরিচিত। বুদ্ধদেব এই সব যজ্ঞানুষ্ঠানকে দূরে সরিয়ে রেখে, কায়িক-বাচিক-মানসিক ভাবে সৎ চরিত্র গঠন করাকে দুঃখ মুক্তি বা নির্বাণ লাভের প্রাথমিক উপায় হিসাবে গণ্য করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গুপ্ত, দীক্ষিত। *নীতিশাস্ত্র*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। প্রথম প্রকাশ- ২০০৭।

২. চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদনা)। *গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। মহাবোধি বুক এজেন্সী। ১৪০৪ সন (১৯৯৭) ।

৩. চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদিকা)। *ভারতীয় ধর্মনীতি*। যাদপপুর দর্শন গ্রন্থমালা: দ্বিতীয় সিরিজ, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৬৫।

৪. ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত। *পবিত্র ত্রিপিটক* (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) । ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ। দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ,২৯ মে ২০১৮।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গাচরণ। *কালিকা পুরাণ* । কলিকাতা বিডিন্ যন্ত্র, ৬৬ নং বিডিন্ স্ট্রীট, ১২৮১।

৬. বসু, শ্রীচারুচন্দ্র। *ধম্মপদ*। প্রকাশক- টি বিমলানন্দ ৪ নং কলেজ স্কয়ার কলিকাতা, গুরুদাস চট্টপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯১৬।

৭. বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল। *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*। বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুন ২০০১ (জৈষ্ঠ ১৪০৮) ।

৮. বিদ্যরণ্য, স্বামী। *বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮৪।

৯. ভট্টাচার্য, অমিত। *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*। কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো। ২০০৩।

১০. ভিক্ষু, শীলভদ্র। *ধম্মপদ*। মহাবোধি সোসাইটী ৪/এ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা। ১৩৫১।

[30] শীলভদ্র, ধম্মপদ, দণ্ডবগ্গো, শ্লোক ১৩, পৃষ্ঠা ৩৬।

[31] তদেব, 'অত্তবগ্গো' শ্লোক ৪, পৃষ্ঠা- ৪১।

[32] বসু, ধম্মপদ, 'ব্রাহ্মণবগ্গো' শ্লোক ৯, পৃষ্ঠা- ২৫০।

১১. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল। *বৌদ্ধ দর্শন*। রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ঢাকা। দ্বিতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১।

১২. সেন, রমাপ্রসাদ। *ধম্মপদ*। জিজ্ঞাসা কলিকাতা ৯/ কলিকাতা ২৯। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৩।

১৩. Ambedkar, B.R. *Buddha and his Dhamma*. created and uploaded by: Siddhartha Chabukswar, 1957.

১৪. Bhikkhu, Nanamoli. *The Middle Length Discourses of the Buddha* (A new translation of the Majjhima Nikaya). Translation edited and revised by Bikkhu Bodhi (original translation from the pali), Sri Lanka. Buddhist Publication Society, Kandy, 1995.

১৫. Dasgupta, S. N. *A History of Indian Philosophy*. Cambridge University Press London, 1932.

১৬. Harvey, Peter. *An Introduction to Buddhist Ethics*. Cambridge University Press New York, 2000.

১৭. Keown, Damien. *Buddhist Ethics: A Very Short Introduction*. Oxford University Press UK, 2005.